নিতুন কুণ্ডুর শাবাশ বাংলাদেশ
নূরুননবী শান্ত

আবৃত্তি সংগঠন স্বননের সদস্য হওয়ায় এবং নাজিম মাহমুদ স্বননের সদস্যদের নিজের সন্তানবৎ জ্ঞান করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান সৃষ্টিশীল আয়োজনের অংশগ্রহণকারী বা শিক্ষার্থী হবার সুযোগ পেতাম আমরা। যেহেতু ভাস্কর্য শাবাশ বাংলাদেশ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে নাজিম মাহমুদ প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন সেহেতু শাবাশ বাংলাদেশ তৈরির ঘটনাক্রম আমরা অন্যদের চেয়ে একটু বেশি করে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

ভাস্কর্য *শাবাশ বাংলাদেশ* এর নির্মাণ কাজ তখন প্রায় শেষের দিকে। আমরা কয়েকজন উৎসাহী আবৃত্তিকর্মী নাজিম মাহমুদের (প্রয়াত) সঙ্গে এক সন্ধ্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের পিছনে গিয়ে হাজির হই। টিনের তাঁবুর ভেতর থেকে কয়েক রাত জাগা নিতুন কুন্ডু বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে শাবাশ বাংলাদেশের চারদিকে ঘুরতে শুরু করলেন। বললেন, এইভাবে ভাস্কর্য দেখতে হয়, তাহলে এর গতিটা তোমরা টের পাবে। আবার গাছে উঠে বা উপর থেকে যদি দেখো তো অন্যরকম লাগবে। তিনি বলেন, If you want to enjoy the music of the sculpture, তো এইভাবেই তাকে দেখতে হবে। আমি জেনে পুলক বোধ করলাম যে লোহা-সিমেন্টের কিংবা পাথরের একটা ভাস্কর্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকে রহস্যময় গীতিময়তা, ভাস্কর্যের থাকে প্রাণ! নিতুন কুণ্ডুর শাবাশ বাংলাদেশ এর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বৃত্তাকারে হাঁটতে হাঁটতে সেই প্রাণের ছোঁয়ায় আন্দোলিত হয়েছিলাম সেদিন।

অনেক সময় দেখা যায় খুব প্রতিভাবানরা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনায় ততটা মনোযোগী হননা। একটু উদাসিন হন। নিতুন কুণ্ডু ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। উদাসিন ভাবালুতা তার মধ্যে দেখা যায় নি। তিনি শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। দু-দুবার চেষ্টা করেও শিক্ষক না হতে পারার জন্য, শুনেছি, আফসোস ছিল তাঁর। তবে পেশাদার শিক্ষক না হয়েও তিনি জাতে আসলে শিক্ষকই ছিলেন। তিনি নিজের উৎসাহে ভাস্কর্য দেখার, উপলব্ধি করার এমন সহজ একটা পদ্ধতি না বলে দিলে আমি (নিশ্চয়ই আরও অনেকে) কখনোই বুঝতে পারতাম না সলিড উপকরণের তৈরি ভাস্কর্যের ভেতর থেকে কীভাবে রস আহরণ করতে হয়।

শাবাশ বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের আগে ১৯৯২ সালের জানুয়ারীর এক সোনালী বিকেলে কবি মোহাম্মদ কামাল নানান কসরত করে, গাছে চড়ে, মইয়ে উঠে ফটোগ্রাফিতে ধরেছিলেন বিশাল এই শিল্পকর্মটির নানান গীতিময় রূপ। সেসময় নিতুন কুণ্ডু কথায় কথায় বলেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় একটা কাজ করব'। সেদিন নাজিম মাহমুদ, হাসান আজিজুল হক ও নিতুন কুণ্ডুর কথোপকথোনের শ্রোতা হিসেবে আমাদেরও জানা হয়ে যায় অনেক তথ্য। শাবাশ বাংলাদেশ তৈরি করার যে মডেল নিতুন কুণ্ডু প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে একটি নারী মূর্তি ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসময়ের কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেয়, কোন নারী মূর্তি বানানো যাবে না। নিতুনেরও জেদ চেপে যায়, তিনি কাজটা করবেন। ফলে তিনি তার ভাস্কর্যের ডিজাইনে পরিবর্তন আনেন। তবে ভাস্কর্যের বেদীর উপরের দেয়ালের মুর‍্যালে নারী অবয়ব রাখেন। ম্যুরালের নারী মূর্তি নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে। এক শুক্রবারের, কোন্ সময় ঠিক মনে নেই, স্বননের সে সময়ের (১৯৯১) যুগ্ম-আহ্বায়ক শিরিন সহ আমরা বেশ কয়েকজন সিনেট ভবনের পিছনের মাঠে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমরা যখন আড্ডা শেষ করে উঠতে যাবো, তখন নিতুন কুণ্ডু আমাদের আরও খানিক্ষণ বসতে বললেন। শিরিন আপাকে বললেন, 'তোমার মুখটায় বাংলার আবহমান নারীর ছায়া আছে, তোমাকে আমি অমর করে দিচ্ছি! কিন্তু তুমি এত নির্লোভ কেন?' আমরা বুঝতেই পারিনি নিতুণ কুণ্ডু শিরিন আপার মুখটা ম্যুরালে বসাচ্ছিলেন। সুতরাং আমরা আরও অনেক্ষণ বসেছিলাম। সেখানে আমাদের সাথে আজকের স্বনামধন্য বিজ্ঞাপন নির্মাতা আপন আহসান ছিলেন কিনা মনে পড়ছে না, তবে তার কাছেই শুনেছি যে তাকেও একদিন এভাবে আটকিয়ে তার মুখটা সেঁটে দিয়েছিলেন ভাস্কর্যের পাদদেশের ম্যুরালে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ভাস্কর্য নির্মাণ বাবদ যে টাকা নিতুনের হাতে দিয়েছিলেন তা দিয়ে ভাস্কর্যের কাঠামোটাও ঠিকমতো দাঁড় করানো যায় নি। নিতুন কুন্ডু পারিশ্রমিকের টাকাসহ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ করেই ভাস্কর্য বানিয়েছেন। যতদূর জানতে পেরেছি নিতুন কুণ্ডু নিজের পকেট থেকে ১০ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ করেছিলেন। বেশ আনন্দের সাথেই এই খরচটা তিনি করেছেন। কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তিটাকে (essence) তিনি শাবাশ বাংলাদেশ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির কথা ভাবেন নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেসময় তাঁর থাকা-খাওয়ারও সম্মানজনক কোন ব্যবস্থা করে নি। এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে, এইসব জেনে, দেখে আমরা লজ্জা পেয়েছিলাম কিন্তু সে সময়ের জামাত-শিবির অধ্যুষিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে বলতে পারিনি না সে লজ্জার কথা। এই ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে চাঁদা তোলা হয়েছিল, তারও কোন সঠিক হিসাব, শুনেছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দিতে পারে নি! আরও আশ্চর্যের কথা এই যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পাবলিক রিলেশন্স সেকশনে শাবাশ বাংলাদেশ নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে প্রচণ্ড হতাশ হতে হয়েছে। তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এমনকি শাবাশ বাংলাদেশ উদ্বোধন উপলক্ষে যে স্যুভেনির বেরিয়েছিল, তারও কোন কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত নেই। বর্তমান পাবলিক রিলেশন্স অফিসার জানিয়েছেন, বিষয়গুলো নাজিম মাহমুদ হ্যাণ্ডেল করেছিলেন তো.... । অর্থাৎ নাজিম মাহমুদের মৃত্যুর সাথে সাথে শাবাশ বাংলাদেশ নির্মাণের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত কাগজ-পত্র হাওয়া হয়ে গেছে।

শাবাশ বাংলাদেশকে স্বপ্নের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন নিতুন কুণ্ডু। চেয়েছিলেন ষ্টিল দিয়ে শাবাশ বাংলাদেশ এর শরীর নির্মাণ করতে, যেমনটা করেছেন সার্ক ফোয়ারায়। টাকায় কুলোয়নি। চেয়েছিলেন আলোর ইফেক্টস্ ব্যাবহার করে ভাস্কর্যে বহুমুখি জীবন্ত ইমেজ ফুটিয়ে তুলতে। সেটাও স্বপ্নই থেকে গেছে টাকার সংকুলান না হওয়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছিলেন প্রতিবছর যেন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ভাস্কর্যের শরীর পরিষ্কার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এটাকে হয়তো অপচয়ই ধরে নিয়েই এ বিষয়ে কান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, প্রগতিশীলতা ও স্বাধীনতার চেতনাবোধকে প্রশাসনের সরাসরি সহায়তায় মৌলবাদের পায়ের তলায় অপমানিত হতে হচ্ছে, সেখানে নিতুনের এই মহৎ অনুরোধ যে রাখা হবে না এটাই বোধহয় স্বাভাবিক।

এই ভাস্কর্যের দিকে তাকালে যে বলিষ্ঠ বাংলাদেশকে পাওয়া যায়, তা আর কোন শিল্পকর্মে পাই না। এস এম সুলতানের ছবির কথা মনে পড়ে অবশ্য। অসাধারণ শক্তি ফুটে উঠেছে দুটি বিরাট মূর্তির মুখে, চোখে, গালের শক্ত পেশিতে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আর তেজী শরীরে। প্রবল গতির বিপরীতে উড়ছে ঝাঁকরা চুল, দৌড়ের ভঙ্গি যেন বলে দিচ্ছে - আমাদের যেতে হবে - দূ..রে - বহু..দূ..রে..। এই ভাস্কর্যে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন বরেন্দ্র এলাকার লাল মাটির রঙ। ভাস্কর্যে ব্যবহার করার জন্য সারা দেশ খুঁজে তিনি নীলফামারীর ডোমার এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন মোটা বালু। যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতুনের কাজ করা দেখেছেন তারা জানেন কী কঠিন পরিশ্রমটাই না তিনি করেছেন। যে লোকটা অটবি নামক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে art-কে industry-তে পরিণত করেছেন, শিল্পী এবং শিল্পপতি দুই হিসেবেই অর্জন করেছেন আকাশচুম্বি খ্যাতি, তিনিই কিনা গায়ে গতরে খেটে, দিন-রাত এক করে খোলা আকাশের নিচে কায়িক পরিশ্রম করছেন মনের আনন্দে! তবে রাতে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন নিতুন। কারণ রাজশাহীতে দিনে গরম আর রোদ থাকতো প্রখর। বিশাল মেটালিক ফ্রেম, ঢাকা থেকে তৈরি করে বয়ে নিয়ে আসা লালচে ব্লকগুলো আদর করে করে সেই ফ্রেমের উপর বসানো দেখতে দেখতে আমরা ভাবতাম যে কোন পেশিবহুল দশাসই ফিগারের শক্তিশালি কোন শিল্পী নিতুন কুণ্ডু। কিন্তু সন্ধ্যার আবছা আলোয় তিনি দেখা দিতেন সাধারণ রূপে, আচারে। আমাদের সাথে গল্প করতেন, যেন অনেকদিনের চেনা, আপন স্বজন।

শাবাশ বাংলাদেশ উদ্বোধন করেছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী। সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সব প্রখ্যাত শিল্পীরাই উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল দেশের বরেণ্য শিল্পী, লেখক, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের এক মঞ্চে দেখার। অনেককেই মন্তব্য করতে শুনেছি, 'গোটা বাংলাদেশ আজ রাজশাহীতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে'। মুক্তিযুদ্ধের একটি ভাস্কর্য উদ্বোধন উপলক্ষে এ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের এত বড় সমাবেশ আর ঘটেছিল কিনা আমার জানা নেই। সে সুযোগটাও করে দিয়েছিলেন নিতুন কুণ্ডু। নিজে পয়সা খরচ করে সবাইকে ঢাকাসহ দেশের নানা স্থান থেকে রাজশাহীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্থপতি রবিউল হুসাইন এ বিষয়ে লিখলে আরও অনেক তথ্যই জানা যাবে, কারণ শাবাশ বাংলাদেশ নির্মাণের সময় ব্যবসার বিরাট ক্ষতি মেনে নিয়ে নিতুন যখন রাজশাহীতে অবস্থান করছিলেন তখন রবিউল হুসাইন কয়েকদিন পরপরই সেখানে গেছেন, নিতুনকে সঙ্গ দিয়েছেন।

অথচ দেশের সবচেয়ে বড় বদ্ধভূমি বুকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যখন মুক্তিযুদ্ধের একটি ভাস্কর্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় তখন প্রথমেই কিন্তু নিতুন কুণ্ডুকে এই মহান কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। প্রথমে ভাস্কর্যের জন্য মডেল আহ্বান করা হয়েছিল। আহ্বানে সারা দিয়ে সব্যসাচি লেখক সৈয়দ শামসুল হক থেকে শুরু করে দেশের অনেক প্রখ্যাত ও অখ্যাত শিল্পী মডেল জমা দিয়েছিলেন। কাইয়ুম চৌধুরী, হাসেম খান, রফিকুন্নবী প্রমুখকে নিয়ে গঠিত বাছাই কমিটি সেই মডেলগুলোর মধ্য থেকে একটিও পছন্দ করতে পারেননি। তাঁরাই রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রাণপুরুষ নাজিম মাহমুদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নিতুন কুণ্ডুর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা একমাত্র নিতুনই করতে পারবে'। নিতুন পেরেছিলেন। অবশ্য আশঙ্কা করা হয়েছিল নিতুন কুণ্ডু রাজি

হবেন কিনা। কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে নিতুন কুণ্ডু আন্তরিকভাবে রাজি হয়েছিলেন কাজটি করতে। এবং নিজের ডিজাইনের সাথে মিল রেখে নাজিম মাহমুদের প্রস্তাব অনুযায়ী ভাস্কর্যের বেদীটি প্রসারিত করে একটি মঞ্চে পরিণত করেছিলেন, যাতে এই ভাস্কর্যের বেদীমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে। হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নানান টাল-বাহানার কারণে তিনি তাঁর স্বপ্নের মতো করে *শাবাশ বাংলাদেশ*-কে নির্মাণ করতে ও সাজাতে পারেন নি। কিন্তু বাংলাদেশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিরাট, মহৎ এক ভাস্কর্য।

২০০০ সালের দিকে একবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি বেদীতে বসানো শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর নাম ফলক কারা যেন রাতের অন্ধকারে মুছে ফেলেছে! এ নিয়ে নিতুন কুণ্ডুর আক্ষেপ ছিল কিন্তু কখনোই উচ্চবাচ্চ করেন নি। তবে যারাই কাজটা করে থাকুক, তাদের জানা উচিৎ, ফলক থেকে নাম মুছে ফেললেই কোন শিল্পীকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব ছিল ভাস্কর্যের বেদীর দেয়ালে নিতুন কুণ্ডুর নাম সম্মানের সাথে আবার বসিয়ে দেয়া। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসান আজিজুল হককে হত্যার হুমুকিদাতারা প্রকাশ্যে বুক উঁচা করে ঘোরে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এটা আশা করিই বা কি করে। এদেরই হুমকির মুখে নারী মূর্তি বাদ দিয়ে নতুন করে শাবাশ বাংলাদেশ এর ডিজাইন করতে হয়েছিল নিতুনকে। আমি জানি না ভবিষ্যতে আমাদের মহৎ প্রাণগণ এ জাতির কাছে কিরূপে প্রতিভাত হবেন। কারণ 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা'। তবুও রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ যথাযথ মর্যাদায় নিতুন কুণ্ডের শেষকৃত্য হতে পেরেছে।

ভাস্কর্য নির্মাণের সময় তিনি প্রায়ই বলতেন, কাজটা আমার, আমাকে এটা যে করেই হোক শেষ করতে হবে। আনন্দের সাথেই শাবাশ বাংলাদেশ নির্মাণের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দুটোই নিতুন কুণ্ডু করেছেন। নিতুন কুণ্ডু, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন আপনি জীবন্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই বাঙালিদের হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে থাকবেন। আপনার শাবাশ বাংলাদেশ-এর বেদীর দেয়ালে উৎকীর্ণ আছে সুকান্তের কবিতার কালজয়ী স্তবক - শাবাশ বাংলাদেশ/ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়/ জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার/ তাবু মাথা নোয়াবার নয়...। জয়স্তু।

নূরুননবী শান্ত
santonabi@yahoo.com
nurunnabi@rdrsrangpur.org
Cell-01716536291